সুন্দরবনের জল, জঙ্গল ও জনজীবনে বাঘ

সুবর্ণ দাস

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

“অনেক দিনের মনোস্কাম হইবে পূরণ, দুখে কে খতে যাবে কেঁদো খালির চরে” — এ কথা তোমার আমার নয়। এ কথা খোদ বাঘরূপী দক্ষিণ রায়ের। সুন্দরবনের জল, জঙ্গলের গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন কথোপকথনে কান পাতলে এই কথা আজও শোনা যায়। সুন্দরবনের কথা সাহিত্যের সিংহ ভাগ জুড়ে আছে বাঘ। এ বাঘ শরৎচন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি, শ্রীনাথ বহুরূপী নয়, যে আপন মনে ডালিয়া গাছের তলায় বসে। ঐ বাঘ সুন্দরবনের ‘রয়েল বেঙ্গল টাইগার’। বাঘ বড় পাজী জানোয়ার। শরীর জোড়া ডোরাকাটা চমৎকার চেহারা আর পৃথিবী জোড়া “রয়েল বেঙ্গল” নামের খ্যাতি থাকলে কি হবে — ব্যাটা সাক্ষাৎ শয়তান। কত মানুষ যে খেয়েছে এই সুন্দরবনে, কত বউকে বিধবা করেছে কত মায়ের কোল খালি করেছে কোন হিসেব আছে তার? অবশ্য গরীবের জান গেল কেই বা হিসেব রাখে। অগত্যা নিজেদের লাঠি, সড়কি, বল্লম, টাঙি ধরতে হয়। জঙ্গলের জানোয়ার গ্রামে ঢুকলে সুন্দরবাসীরা অনেক সময় বনকর্তাদের তোয়াক্কা না করে কুপিয়ে মারে। কিন্তু বাঘ মারলে সুন্দরবনের সবার ক্ষতি একথা সুন্দরবন বাসীরা ভুলে যাচ্ছে। বাঘকে কুপিয়ে মারার আগে ঠান্ডা মাথায় দুবার ভাবতে হয়। কেননা, এতে যে মস্ত ক্ষতি হচ্ছে গ্রামবাসীদের। বাঘ মারলে সুন্দরবনে সবার ক্ষতি। বাঘকে যত পাজী জানোয়ার বলা হোক না কেন বাঘই কিন্তু বিশাল সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের বিশ্বস্ত প্রহরী। সভ্য সমাজের মানুষ রক্ষীরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, কিন্তু বাঘ বা জঙ্গলের জানোয়ার বিশ্বাসঘাতকতা করে না। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ভয়ে লোভী শিকারী জলদস্যু, ডাকাত বা চোরাকারবারীরা গভীর বনে ঢুকতে পারত না। দেড়শ বছর ধরে বাঘই তিল তিল করে বাঁচিয়ে রেখেছিল সুন্দরবনের বিশাল ম্যানগ্রোভ অরণ্যকে। আর সেই জন্য বনবিবি বাঘকে বাহন করেছেন। কিন্তু দুঃখের কথা বাহনের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে। সেই সঙ্গে জঙ্গলও হাসিল হচ্ছে, মিঠে জলের দীঘিতে নোনা জল ঢোকাতে হচ্ছে। সাহেবদের হিসেব অনুযায়ী একশ বছর আগে সারা ভারতে ৪০ হাজার বাঘ ছিল, তার মধ্যে বড় অংশ ছিল সুন্দরবনে তখনকার সাহেব রাজা রাজরা আর কিছু চোরা শিকারীর নির্মম আনন্দ মেটাতে শয়ে শয়ে হত্যা করা হয়েছে বাঘ। ভারতের ওয়াইল্ড লাইফ বিভাগের পরিসংখ্যান বলছে — ৪০ হাজার থেকে কমতে কমতে ১৯৬৪তে সারা দেশে বাঘের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় মাত্র ৪ হাজারে, ১৯৭২-সেটা ২ হাজারেরও নীচে নেমে আসে। সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা এখন মাত্র কয়েক’শ। জঙ্গলের গাছ ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীর কৃপায় হাজারে হাজারে লোপাট হয়ে যাওয়ায় বাঘ আর লুকানোর ভালো জায়গা পায় না। সংগঠিত চোরাশিকারীরা সেই সুযোগে বেধড়ক ব্যাঘ্র হত্যা চালায় অত্যাধুনিক বন্দুক বা বিষ মাখানো মাংস দিয়ে (কিছু দুষ্ট প্রকৃতির গ্রামবাসী আর বনরক্ষীও পয়সার লোভে ওদের সাহায্য করে)। ওরা কিন্তু বাঘ মেরে কুপিয়ে খন্ডবিখন্ড করে না। কারণ বাঘের গোটা ছাল আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেশী বিদেশী বাজারে চড়া দামে বিক্রি হয়। প্রচুর টাকা। এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে ১৯৭০ সালে ভারত সরকার বাঘ শিকার বেআইনি ঘোষণা করে। ১৯৭২-এ বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন চালু হয়। ১৯৭৩-এ ব্যাঘ্র প্রকল্প বা দপ্তর তৈরী হয়। এর পরে পরিস্থিতি কিছুটা আয়ত্তে এসেছিল। গ্রামবাসীদের সহায়তায় প্রকল্পের অফিসার ও কর্মীরা বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন; ১৯৮৮-৮৯ তে সারা দেশে বাঘের সংখ্যা উঠেছিল৪,৩৩৪ পর্যন্ত, সুন্দরবনে ৫০০-র বেশী। কিন্তু ব্যাপক চোরাশিকার, অরণ্য নিধন, আর জনবসতি বৃদ্ধি ঠেকানোর সাধ্য নেই ‘ব্যাঘ্রপ্রকল্প’ দপ্তরের। ফলে আবার বাঘের হত্যা বাড়তে থাকে। সুন্দরবনে ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় গত দশকে সরকারি ব্যাঘ্র সুমারিতে দেখা যাচ্ছে ১৯৯৩-এ ব্যাঘ্র ছিল ২৫১, ১৯৯৫-তে ২৪২টি, ১৯৯৭-তে ২৬৩ আর ১৯৯৯-এ ২৫৪টি। বেসরকারি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাঘের প্রকৃত সংখ্যা

আরও কম। সে কথা থাক।

এখন এই দু'আড়াইশো বাঘের অবস্থা একটু ভাবুন। ওরা সবসময়ে মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কিত। জঙ্গল সাফ হচ্ছে মানে ওদের শিকারে অসুবিধা হচ্ছে, নিরাপদে নিশ্চিন্তে থাকতে পারছে না। খিদের জ্বালায় উপায় না দেখে মৌলি, কাঠকুড়ানি, মৎস্য চাষী বা মীন সংগ্রাহকদের ঘাড়ে লাফ দেয়, মেরে ফেলে এটা ঠিক। আবার কখনো নদী পার হয়ে ওরা গ্রামে ঢুকে পড়ে গ ছাগলের লোভে, এমনকি নিজেদের বিশাল লোকালয়ে এসে যায়। কিন্তু মানুষকে ওরা গ্রামে ঢুকে কখনো মারে না। দৈব াৎ বিপদে না পড়লে সুন্দরবনের বাঘ সাধারণভাবে নরখাদক নয়। গবাদি পশু পেলে, খিদে মিটলে, মানুষের গায়ে আঁ াচড়ও দেয় না। বরং মানুষকে বাঘ খুবই ভয় পায়। তাই লুকিয়ে সব কাজ সারে। দেখুন না, সুন্দরবনের গ্রাম গুলোতে গত ১০ বছরে বাঘ ঢুকেছে বেশ কয়েকবার, কিন্তু একটিও মানুষ মরে নি। এই যে সজনেখালি পাখিরালয় এত কান্ড হল এখানেও গত ১০ বছরে বাঘ ঢুকেছিল মাত্র ২/৩ বার খাবারের খোঁজে, একটি মানুষকেও কিন্তু আক্রমণ করেনি। .....তবে ভয় পেলে, কোণ ঠাসা হয়ে গেলে, খোঁচাখুঁচি খেলে শুধু বাঘ কেন যে কোনো বন্য জন্তুই তো থাবা ওঠাবে নিজে বাঁচার জন্য, তাই না? তাই বলছিলাম, বেচারি বাঘেদের ওপর আমাদের যতখানি রাগ, যতখানি আক্রোশ, যতখানি নৃশংসতা ইদানিং দেখা যাচ্ছে — বাঘ কিন্তু ততটা দোষী বা শত্রু নয়। বরং বাঘ যত মরবে তত শয়তান দুষ্কৃতি চোরা শিকারীর দ াপট সুন্দরবনে বাড়বে। সাধারণ গ্রামবাসীদের নিরাপত্তা আরো কমবে, জীবন অতিষ্ঠ হবে। তাই বলে কি বাঘ গ্রামে এসে হামলা করলে তাকে আদর করে ছেড়ে দিতে হবে? না, তা কখনই হয় না, কেউই তা করতে বলবে না। তবে ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিসে দ্রুত খবর দেওয়া এখন মোটেই কঠিন কিছু নয়। প্রকল্প থেকে 'টিম' এসে ব্যবস্থা নেবে। দরকার হলে ঘুম পাড়ানি বন্দুক দিয়ে বাঘটাকে বন্দী করবে। কিন্তু কোন মতেই সেটাকে হত্যা করা ঠিক হবে না। সুন্দরবনবাসীদেরই ক্ষতি ব াড়বে তাতে। বিশেষ করে বাঘ যখন নিজের মনে নির্জনে বসে আছে কিংবা লোকালয়েরই বাইরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে, কে ানো জ্বালাতন করছে না, তখন তাকে দলবদ্ধভাবে গিয়ে আক্রমণ করে কুপিয়ে মারাটা অন্যায় কাজ হবে, ভুল কাজ হবে, তাই না? আপনারাই ভেবে দেখুন! আর সরকার পক্ষ থেকে সুন্দরবন এবং সুন্দরবনের মানুষকে বাঁচানোর জন্য যে কোন প্রকল্পই নেওয়া হোক না কেন, যেমন বাঘ্র প্রকল্প বা অন্য ব্যবস্থা তা গভীরভাবে ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুন্দরবনের বাঘের নাম বা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের নাম শোনেনি এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সুন্দরবনে যত প্রাণী আছে তার মধ্যে সবার আগে বাঘের নাম বলতে হয়, সুন্দরবনের বাঘ অন্যান্য যে কোনো বাঘের চেয়ে শক্তিশালী এবং হিংস্র, এলাকার সবাই এই রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ভয়েই আতঙ্কগ্রস্ত থাকে।

সুন্দরবনের পরিবেশ শৃঙ্খলা আবর্তিত হয় বাঘকে ঘিরে, বাঘ প্রকৃতির পাহারাদার হিসাবে জঙ্গল রক্ষা থেকে শু করে হরিণ শুয়োরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। সুন্দরবনে বাঘের প্রয়োজন অত্যধিক, বাঘের অবস্থানের কারণে এখনও কিছুটা হলেও চোর-ডাকাতেরা সম্পদ আহরণ করতে ভয় পায়, বাঘ না থাকলে মানুষ অনেক আগেই সুন্দরবন ধবংস করে ফেলতো।

সুন্দরবনে বাঘের দেখা পাওয়া খুবই ভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। সুন্দরবনে যাতায়াতকারী বনজীবিরা বলে থাকেন, ব াঘের দেখা না পাওয়াই ভাল, যে বাঘ দেখে সে আর ফিরতে পারে না। বাঘ দেখতে না পাবার কারণ, সে রাতে চলাফের া করে। তাছাড়া বাঘের চাল চলন নিঃশব্দ, দ্রুত ছায়ায় শরীর মিশিয়ে আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত টের পাওয়া যায় না। বাঘ দিনের বেলায় জঙ্গলে বা ঝোপে ঘুমিয়ে কাটায়, শীতকালে গরাণ বনে গায়ে রোদ লাগিয়ে ঘুমোয়। বিকেল থেকে শিকারে বের হয়, প্রথম দফায় রাত দশটা-এগারটা পর্যন্ত। দ্বিতীয় দফায় রাত চারটে থেকে ভোর পর্যন্ত শিকারের খোঁজে টহল দেয়।

বাঘ জলে স্থলে সমান শক্তিশালী, সাঁতারে অত্যন্ত পটু। মাছ, কাঁকড়া বাঘের খুব পছন্দ, সুন্দরবনের বাঘের খাবারের ৬০

ভাগ যোগায় হরিণ, ৩৫ভাগ শুয়োর, বাকী ৫ ভাগ কাঁকড়া, মাছ, গুঁইসাপ ইত্যাদি হতে আসে। এছাড়া বাঘ কখনো খাবারের জন্য মানুষ বন সংলগ্ন এলাকার গবাদি পশু ইত্যাদি খেয়ে থাকে। বাঘ নিয়ে গবেষণা করেন এমন ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, শতকরা ৩ থেকে ৪ ভাগ বাঘ মানুষ খেকো। সুন্দরবন — বাঘের মানুষ খাওয়ার প্রবণতা নিয়ে নানা মত রয়েছে। কেউ বলেন, মানুষ শিকারের ঘটনা জলের লবণের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে। ক্রমাগত লবণ জল পান করে বাঘের যকৃত ও মূত্রনালীর ক্ষতি হয়, তখন বাঘ বদরাগী হয়ে মানুষকে আক্রমণ করে। অন্য একটি মত হোল, বনে অন্য কোন ভাল আচ্ছাদনের অভাব থাকায়, হেতাল ঝোপই বাঘের পছন্দসই আস্তানা। বাঘিনীও বাচ্চা নিয়ে এই ঝোপে থাকে, এসময় কেউ জঙ্গলে নেমে বিরক্ত করলে বাঘ আক্রমণ করে, এছাড়াও বাঘের মিলন ঋতুতে মানুষের পদচারণায় বাঘ বিরক্ত হলে আক্রমণ করে। পশ্চিমবঙ্গের দু'জন গবেষক ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত বাঘে আক্রমণ করেছে এমন ঘটনার ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, সাধারণত বাঘের মানুষ খাওয়ার ঘটনা ঘটে সকাল ৭টা থেকে ৯টার মধ্যে, বিকেল ৩টা থেকে ৫টার মধ্যে এবং রাত ১১টা নাগাদ। অধিকাংশ মানুষই আক্রান্ত হয় পিছন থেকে। বাঘে মানুষ খাওয়ার ঘটনা সবচেয়ে বেশী মে মাসে এবং সবচেয়ে কম ডিসেম্বর মাসে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মে মাসের চেয়ে ডিসেম্বর মাসে জঙ্গলে লোক বেশী প্রবেশ করে। কিন্তু মে মাসে বেশী মানুষ আক্রান্ত হবার কারণ, এ সময় জঙ্গলে মৌয়ালরা মধু আহরণে জঙ্গলে থাকে, মৌয়ালদের সঙ্গত কারণে উপর দিকে অর্থাৎ গাছের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হয়। একারণেই হয়তো মৌয়ালরা সহজে বাঘের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়।

সুন্দরবনে বাঘের সঙ্গে মানুষের সংঘাতের মূলে রয়েছে দারিদ্র্য, অভাব-অনটন। শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহনের জন্যে তারা জলেতে কুমীর-হাঙ্গর, ডাঙ্গায় হিংস্র বাঘ, বিষধর সাপকে উপেক্ষা করে সুন্দরবনের সম্পদ আহরণ করে।

'জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ' — এই হল সুন্দরবন। বাস্তবিকই বনের স্থল জন্তুর মধ্যে ব্যাঘ্র সর্বপ্রধান। বিশ্বে অনেক রকম বাঘ দেখতে পাওয়া গেলেও সুন্দরবনের বাঘের মত এত হিংস্র, এমন বলবান, এমন দর্পশালী, এমন ভীমমূর্তি এবং পটু বন্য জন্তু আর কোথাও নেই। ইউরোপীয়রা বাঘকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামে অভিহিত করেছিল। এই বাঘের গায়ে হরিদ্রাবর্ণ লম্বা লম্বা কালো ডোরা থাকে যা অন্য কোন বাঘের গায়ে দেখতে পাওয়া যায় না। ১০/১২ ফুট লম্বা আর ৩/৪ ফুট উচচ হয়। সামনের পা দুটি বেশ মোটা ও শক্ত। তবে পিছনের পা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। বাঘের মাথা প্রকান্ডও গোলাকার এবং চক্ষুদ্বয় খুব বড় ও অত্যন্ত উজ্জ্বল। শিকারের সময় আরো বেশী উজ্জ্বল ও বিকটাকার ধারণ করে যা কেউ দেখলেই শিহরিত হয়ে যাবে। যে কেউ এ দৃশ্য দেখলে আত্মহারা না হয়ে পারবে না। একটি বড় বাঘ অনায়াসেই ১টি গ মহিষকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে পারে। একটা বাঘিনী ২ হতে ৪টি বাচচা পর্যন্ত দিতে পারে। তবে এর অন্যতম বিশেষত্ব বাঘিনী বাচচা প্রসবের পর সে বাচচা গুলো নিয়ে পুষ বাঘ হতে দূরে থাকে। কারণ বাঘে বাচচা খেয়ে ফেলে। বাচচা ৬/৭ মাস পর্যন্ত দুধ পান করে। সুন্দরবনের পরিবেশের শৃঙ্খলা আবর্তিত হয় বাঘকে ঘিরে। বাঘের কারণেই মানুষ সেখানে অবাধে যেতে ভয় পায়। তাই বাঘ প্রকৃতির পাহারাদার হিসেবে সুন্দরবন রক্ষা করে থাকে। বাঘ অতিরিক্ত হরিণ ও শুয়োর-এর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। এর সংখ্যা বেশী হলে তা চারা গাছ নষ্ট করে ফেলে যা গাছের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায়। আবার বাঘের দ্বারা চোর-ডাকাতেরও অবাধ চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাঘকে সকলে স্বচক্ষে দেখতে আগ্রহী। বাঘের হরিণ শিকার বা উজ্জ্বল রক্তচক্ষু সকলকে আকর্ষণ করে থাকে। তাই বাঘের জন্য অভয়ারণ্য তৈরী করে সেখানে বাঘের চাষ এবং স্বচক্ষে দেখবার ব্যবস্থা করতে পারলে পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। বাঘ সাধারণত ৩০/৩৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে।

পরিবেশ গত দ্বৈবারিত বাঘের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। এদের স্বাভাবিক জীবন চক্রের জন্য মিষ্টি জলের অতি প্রয়োজন। কিন্তু কালক্রমে সুন্দরবন সংলগ্ন নদ-নদীর জলেতে অস্বাভাবিক লবনাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জল পান করে বাঘ জন্ডিস ও লিভার সিরসিস সহ নানা ধরনের জটিল আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে।

বাঘের শিকার ঃ— সুন্দরবনে বাঘের হাতে যে সমস্ত মানুষ প্রাণ হারায় তাদের অধিকাংশ মৎস্যজীবী। জঙ্গলে বাঘের খাবার কম। দূর থেকে দৌড়ে গিয়ে শিকার ধরাই বাঘের স্বভাব। সুন্দর বনের কাদা মাটি আর ঘন জঙ্গলে সেটা সম্ভব হয় না। তাই নদীর পাশে বেরিয়ে এসে ফাঁকা জায়গায় মানুষ দেখে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে জেলেরাই বেশির ভাগ বাঘের মুখে পড়ে। সুন্দরবনে বাঘের জন্য দিনে ১০কেজি মাংসের প্রয়োজন। এমনিতে জন্মগত ভাবে সুন্দরবনের বাঘ মানুষ খেকো নয়।

বাঘের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ— বাঘ (স্ত্রী পুষ নির্বিশেষে) বসবাসের ক্ষেত্রে নিজস্ব সীমান্তেই সীমাবদ্ধ থাকে। এক একজনের জন্য প্রয়োজন ১০বর্গ কিঃমিঃ এলাকা। ফিরোমেন গ্রন্থি থেকে রস নিঃসরণ করে, গাছের ডালে নখ ঘষে দাগ কেটে দিয়ে এবং এলাকার সীমান্তে মল ত্যাগ করে নিজস্ব সীমারেখা জানিয়ে দেয় অন্য বাঘকে। বাঘ ও বাঘিনীর সীমানা পৃথক। এক মাত্র মিলনের সময়েই বাঘিনীর এলাকায় বাঘ ঢোকে। সন্তান প্রসবের পর বাঘ বিশেষতঃ পুষ বাচচাটিকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। বাঘের হাত থেকে বাচচাদের বাঁচাতেই বাঘিনী বাচচাগুলোকে নিয়ে গ্রামের দিকে বা নদীর কাছাকাছি চলে আসতো। ৩ বছরে বাঘ সাবালক হয়।

সুন্দরবনে ব্যাঘ্র প্রকল্পের আয়তন ও ভৌগোলিক অবস্থান
সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত মোট ২৫৮৫.১০বর্গ কি.মি.
সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অর্ন্তগত কোর অঞ্চল, যা ১৯৮৪ খ্রীঃ
জাতীয় উদ্যানরূপে ঘোষণা হয়েছে — ১৩৩০.১০ বর্গ কি. মি.
সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত বাফার অঞ্চল — ৮৯২.৬০ বর্গ কি. মি.
সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত সজনেখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য — ৩৬২.৪০ বর্গ কি. মি.
ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত মোট বনাঞ্চল ১৬৮০ বর্গ কি.মি.
ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত মোট জলাঞ্চল — নদী, সূতি খাল, খাল ইত্যাদি — ১০৪,৭৮ বর্গ কি. মি.

সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্লক ও স্থানের পরিমাণ

ক্রমিক সংখ্যা	ব্যাঘ্র পকল্পের অন্তর্গত ব্লকের নাম	মোট পরিমাণ
সংখ্যা	ও বন কম্পার্টমেন্টের সংখ্যা	(হেক্টর)
১	পঞ্চমুখানী-৫টি কম্পার্টমেন্ট	১৭,৬৬৫.৯৬
২	পীরখালি-৭টি কম্পার্টমেন্ট	১৭,৬২৯.৯৪
৩	মাতলা-৪টি কম্পার্টমেন্ট	১৭,৬২৯.৯৪
৪	চামটা-৮টি কম্পার্টমেন্ট	২২,০৬৮.৬৯
৫	ছোটহরদি-৩টি কম্পার্টমেন্ট	১৭,৫৬৬.৮১
৬	গোয়াসবা-৪টি কম্পার্টমেন্ট	১৭,১৭৩.৩০
৭	গোনা-৩টি কম্পার্টমেন্ট	১৩,৯০৩.৪৬
৮	বাগমারা-৫টি কম্পার্টমেন্ট	২৯,৩৯৩.৩৫

৯	আরবেশী-৫টি কম্পার্টমেন্ট	১৫,০৪২.৬৯
১০	ঝিল-৫টি কম্পার্টমেন্ট	১২,৩১৩.৮০
১১	খাটুয়াঝুড়ি-৩টি কম্পার্টমেন্ট	১৩,২৪১.৩৭
১২	হরিণভাঙ্গা-৩টি কম্পার্টমেন্ট	১১,৬৮৬.৯১
১৩	নেতাধোপানী-৩টি কম্পার্টমেন্ট	৯,৩০০.০০
১৪	নেতাধোপানী-৩টি কম্পার্টমেন্ট	১৫,৫৯০.৬৫
	মোট	২,৫৮,৪৮৯.০৪

সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত ব্লক অঞ্চলের নাম ও পরিমাণ

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	মোট স্থানের পরিমাণ(হের)	জলাভূমির পরিমাণ (হের)	বনাঞ্চলের পরিমাণ (হের)
১	পঞ্চমুখানি ব্লক	১৭,৬৬৫.৯৬	৩,৭১৯.১৯	১৩,৯৮৬.৭৭
২	পীরখালি ব্লক	১৮,৫৭৬.১২	৪,৮৯১.৬০	১৩,৬৮৪.৫২
৩	মাতলা ব্লক	১৭,৬২৯.৯৪	৬,১২২.৩০	১১,৫০৭.৬৪
৪	চামটা ব্লক	৪৪,০৬৪.৬৯	৫,১৯২.৭০	১৬,৮৭৫.৯৯
৫	ছোটহরদি ব্লক	১৭,৫৬৬.৮১	৮,৩০৬.০৬	৯,২৬০.৭৫
৬	গোয়াসবা ব্লক	১৭,১৭৩.০৩	৬,৬৫৮.৯৩	১০,৫১৪.১০
৭	সোনা ব্লক	১৩,৯০৩.৪৬	৫,৩৪০.৮২	৮,৫৬২.৬৪
৮	বাগমারা ব্লক	২৯,৩৯৩.৩৫	১২,৮১৬.৮৪	১৬,৫৭৬.৫১
৯	মায়াদ্বীপ ব্লক	২৭,৩৩৬.২৬	১৪,৩৩৮.১১	১২,৯৯৮.৮৪
১০	আরদেশী ব্লক	১৫,০৪২.৬৯	৫,৩৭৮.৮৬	৯,৬৬৩.৮৩
১১	ঝিলা ব্লক	১২,৩১৩.৮০	৩,৫৭৩.০৯	৮,৭৪০.৭১
১২	খাটুয়াঝুরি ব্লক	১৩,২৪১.৩৭	৩,৬৯৩.৬৯	৯,৫৪৭.৬৪
১৩	হরিণভাঙা ব্লক	১১,৬৮৬.৯১	৩,২৯৫.৮৭	৮,৩৯১.০৪
১৪	নেতাধোপানী ব্লক	৯,৩০০.০০	২,৮৫২.৩২	৬,৪৪৭.৬৮
১৫	চাঁদখালী ব্লক	১৫,৫৯০.০০	৪,২৯৭.০০	১১,২৯৩.১৫
	মোট	২,৫৮,৪৮৯.০৮	৯০,৪৭৭.৮৮	১,৬৮,০১১.১৬

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত মোট অঞ্চল — ২৫,৮৪,৮৯.০০ হেক্টর
সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত জেলা অঞ্চল — ৯০, ৪৭৭.৮৮ হেক্টর
সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত বনভূমি — ১,৬৮০,১১.১৬ হেক্টর

তথ্যসূত্র

১) সুকুমার সিং সম্পাদিত — সুন্দরবন ঃ দারিদ্র ও বঞ্চনার ইতিহাস, মাল্টি বুক হাউস মহামায়াতলা, গড়িয়া।
২) Annual Report of 24 Parganas Zilla Parishad, Alipur, 2001
৩) ব-দ্বীপ বার্তা। বনবিবি উৎসব সংখ্যা। ৩রা জানুয়ারী, ২০০২।
৪) সুবর্ণ দাস। বাদাবনের বনবিবি (কিশোর কল্লোল পূজা সংখ্যা)। ১৯৯৯

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com